আমাদের ছাত্রাবস্থা ও রবীন্দ্রনাথ – Bangla Library

আমাদের ছাত্রাবস্থা ও রবীন্দ্রনাথ – Bangla Library

আমাদের ছাত্রাবস্থা ও রবীন্দ্রনাথ

চল্লিশ বছর পূর্বে যখন প্রবেশিকার দরোজা পার হয়ে কলিকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হয়েছি। তখন ছাত্রমহলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি মনোভাবের মধ্যে কৌতুহল সবচেয়ে প্রবল। ‘ক্ষণিকা’ পর্যন্ত প্রকাশ হয়েছে। নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শনে ‘চোখের বালি’ চলছে। ভারতীতে ‘চিরকুমার সভা’ বেরিয়েছে। ছোটগল্পের অনেকগুলি বিখ্যাত গল্পই লেখা হয়েছে। প্রদীপে ‘কাদম্বরী-চিত্র ভারতীতে ‘কাব্যের উপেক্ষিতা’ বের হয়েছে। কালিদাসের কাব্য-সমালোচনার প্রবন্ধগুলি প্রকাশ্য সভায় পড়া হয়ে বঙ্গদর্শনে ছাপা হচ্ছে। বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণের আলোচনা শুরু হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গান বাঙালির কণ্ঠ একচেটে করার উদ্যোগ করছে। এ কবি ও লেখক যে নূতন ধরনের এবং সম্ভব জীবিতদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এ ধারণা দেশে, সুতরাং ছাত্রদের মধ্যে এসেছে। কিন্তু আমাদের

চোখের সামনে যে এই বাংলাদেশে এক আশ্চর্য উৎকর্ষের বহুমুখী প্রতিভা এমন সৃষ্টি করে চলেছে যার তুলনা পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে কদাচিৎ মেলে সে জ্ঞান জন্মেনি এবং সে কথা ভাবার সাহসও মনে ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য যে অস্পষ্ট, ওর মধ্যে যে শক্ত কিছুকে আঁকড়ে ধরে পেয়েছি বলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না (যে অভিযোগ আমাদের ছাত্রজীবনের শেষ সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এনেছিলেন), সে নালিশ আমাদের মধ্যে একদলের মনে ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টি তো একরকমের নয়। অল্পদিন পূর্বে প্রকাশিত 'কথা' ও 'কাহিনী'র কবিতাগুলি আমাদেব সকলের মন লুট করে নিয়েছিল, 'সন্ন্যাসী উপগুপ্ত' কি 'পঞ্চ নদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে' আমাদের অনেকেরই মুখস্থ ছিল। পুরানো University Institute-এর হলে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বন্দী বীর' যেমন আবৃত্তি করেছিলেন ঠিক তেমনি গলায় সেইরকম আবৃত্তির চেষ্টা তখন অনেকেই করেছি। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠত রবীন্দ্রনাথকে দেখার আগ্রহ ও তাঁর গান শোনার লোভ। এ কবির আকৃতি ও প্রকৃতি, স্বর ও সুর যে আর পাঁচজনার মতো নয়, অভিনব জিনিস, এ ছিল প্রকাণ্ড আকর্ষণ। রবীন্দ্রনাথ যে সভায় কোনও প্রবন্ধ পড়তেন সেখানে ছাত্রদের ভিড় হত অসম্ভব রকম। কিন্তু সে ভিড় কেবল তার প্রবন্ধ শুনতে নয়, তাকে দেখতে ও তার পড়া শুনতে। এবং সভায় রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ-পাঠকই থাকুন, আর সভাপতিই থাকুন সভার শেষে তাঁর গান শোনার দাবি ঐকতান চিৎকারে আমরা বরাবর জানিয়েছি, আর এ কাজে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লোককেও মাঝে মাঝে abetitor পাওয়া যেত। তার সাহিত্যে ও তার জীবনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। আমাদের পরম বিস্ময়ের বস্তু।

২

এরপর যখন কলেজের উচু শ্রেণিতে উঠেছি তখন এল বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন। যে আবেগ ও উত্তেজনা বাঙালি শিক্ষিত সম্প্রদায়ে, বিশেষ আমাদের ছাত্র সম্প্রদায়ে জেগে উঠল তার অনুরূপ কিছু এ সম্প্রদায়ের জীবনে পূর্বে কখনও ঘটেনি এবং পরেও আজ পর্যন্ত ঘটেনি। এই দেশব্যাপী উন্মাদনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তার দূরত্ব ঘুচিয়ে আমাদের মধ্যে এলেন, হয়ে উঠলেন ছাত্রদের অন্তরঙ্গ। প্রথম রাখীবন্ধনের দিনের গান চাই। 'বাংলার মাটি বাংলার জল' প্রস্তুত। টাউন হলের বিরাট জনসভায় গাওয়ার জন্য গান দরকার। এল 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।' তার সুরের সঙ্গে আমাদের বেসুর মিশিয়ে সে গান আমরা সে সভায় গেয়েছি। দিনের পর দিন তার প্রবন্ধে, কবিতায়, গানে আমাদের অনুভূতির তন্ত্রী ঝনঝনি করে কেঁপে উঠতে লাগল।

‘মোদের যাত্রা হলো শুরু এখন ওগো কর্ণধার।’

‘বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান।’

‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে। তবে একলা চল রে।’

‘যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা না।

ভয় থাকে ত করি মানা।’

সেদিনকার কতক গান কাব্য-ভাণ্ডারে অক্ষয় হয়ে থাকবে। কিন্তু সেদিনের তরুণ যুবকদের পক্ষে বৃদ্ধ বয়সেও বিশুদ্ধ সাহিত্যিক বোধ দিয়ে এসব গান যাচাই করা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের গান কণ্ঠে নিয়ে নির্ভয়ে ফাসিকাঠে উঠতে পারে তার সংখ্যা আমাদের মধ্যে কম ছিল না। সে মোহের অবশেষ মনের মধ্যে আজও আছে।

এই রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সঙ্গে এবং তারই ফলে, যখন শিক্ষার আন্দোলন এসে মিশল তখন দেশের ছাত্রসমাজ এল রবীন্দ্রনাথের মনের আরও কাছে। আর আমরা তার মন জয় করে নিলুম দেশের দরিদ্র ও অসহায়দের সেবাতে সংঘবদ্ধ কর্মকুশল নিষ্ঠায়। সুরাটে কংগ্রেসি যজ্ঞভঙ্গের পর দেশের নরমপন্থী ও চরমপন্থী politics-এর ফাটল ঢাকার চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথকে করা হল ‘পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী’র সভাপতি। এর অল্পদিন পূর্বে বাংলার তরুণ সম্প্রদায় এই নিষ্ঠা ও কর্মকুশলতার একটা বড় পরিচয় দিয়ে দেশকে চমৎকৃত করেছিল অধোদয় যোগ উপলক্ষে। তার অভিভাষণের শেষদিকে এই তরুণদের সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপরূপ কণ্ঠে পড়লেন–’রক্তবর্ণ প্রত্যুষে তোমরাই সর্বাগ্রে জাগিয়া উঠিয়া অনেক দ্বন্দ্রসংঘাত এবং অনেক দুঃখ সহ্য করিলে, তোমাদের সেই পৌরুষের উদ্বোধন কেবলমাত্র বজ্রঝংকারে ঘোষিত হইয়া উঠে নাই, আজ করুণাবর্ষণে তৃষ্ণাতুর দেশে প্রেমের বাদল আনিয়া দিয়াছে। সকলে যাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছে, অপমানে যাহারা অভ্যস্ত, যাহাদের সুবিধার জন্য কেহ কোনোদিন এতটুকু স্থান ছাড়িয়া দেয় নাই, গৃহের বাহিরে যাহারা কাহারো কাছে কোনো সহায় প্রত্যাশা করিতেও জানে না তোমাদের কল্যাণে আজ তাহারা দেশের ছেলেদিগকে ভাই বলিতে শিখিল। তোমরা ভগীরথের ন্যায় তপস্যা করিয়া রুদ্রদেবের জটা হইতে এবার প্রেমের গঙ্গা আনিয়াছ; ইহার প্রবল পুণ্যস্রোতকে ইন্দ্রের ঐরাবতও বাধা দিতে পরিবে না, এবং ইহার স্পর্শমাত্রেই পূর্বপুরুষের ভস্মরাশি সঞ্জীবিত

হইয়া উঠিবো! হে তরুণতেজে উদ্দীপ্ত, ভারতবিধাতার প্রেমের দূতগুলি, আমি আজ তোমাদের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া এই নিবেদন করিতেছি যে, দেশে অধোদয় যোগ কেবল এক দিনের নহে।'

আমরা তখন সবেমাত্র কলেজের পাঠ শেষ করেছি। অনেক ছাত্র ও আমাদের মতো অনতিপূর্ব-ছাত্র এ সম্মিলনে উপস্থিত ছিল। মনে হল আমাদের চেষ্টা ও শ্রমের পুরস্কার পেয়ে গেলাম।

৩

আমাদের ছাত্রজীবনে রবীন্দ্রনাথের এ প্রভাব অবশ্য 'বাহ্য'। মনে তার কাব্য ও সাহিত্যের যে স্পর্শ সেই স্পর্শই অন্তরতম, আর তার যা ফল সেই ফলই চরম ফল। নিশ্চয় আমাদের সকলে সে স্পর্শ পায়নি। যাঁরা পেয়েছিল তাদের অনেকের মনে যে ফল ফলেছিল তার স্বরূপ বলছি।

আমরা যখন কলেজে পড়ি তখন বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষায় চলছে, dark age। ইংরেজি সাহিত্যের যে রস আমাদের পূর্বতনদের চিত্ত সরস করেছিল, ইউরোপের যে নব বিদ্যা ও চিন্তা তাদের মনকে মোহমুক্তির নাড়া দিয়েছিল— তাকে প্রসন্ন ঔদার্যের সঙ্গে গ্রহণ করতে আমাদের মনে এসেছিল সংকোচ। ও-বিদ্যা ও-চিন্তায় যে আমাদের দেশের কোনও দান নেই, অথচ তাকে আয়ত্ত করাই উচ্চশিক্ষা; আমাদের অধ্যাপকেরা যে তাকে যাচাই করেন না, কেবল ওর ভার নিজের মন থেকে আমাদের মনে নামিয়ে দেন, তার পীড়ায় আমাদের মনের গ্রহণের শক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল না। এ বিদ্যার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের বিস্ময় দেশ থেকে কেটে গিয়েছিল, কিন্তু মনের মাটিতে শিকড় চালিয়ে তার অঙ্কুরোদগম আরম্ভ হয়নি। সুতরাং আমাদের কাছে। এ বিদ্যা ছিল পরীক্ষা পাশের উপায় মাত্র অর্থাৎ বোঝা আচার্য জগদীশচন্দ্রের অভ্যর্থনার গানে–

'জয় তব হোক জয়

স্বদেশের গলে   দাও তুমি তুলে

যশোমালা অক্ষয়।....

দুঃখ দীনতা যা আছে মোদের

তোমারে বাঁধি না রয়।’

যে মনঃপীড়া প্রচ্ছন্ন আছে আমরা ছাত্রদের অনেকে তার গ্লানি থেকে মুক্ত ছিলাম না। আজ এ দুঃস্থত কতকটা দূর হয়েছে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি ও কর্মশক্তির কল্যাণে।

আমাদের মন্দ ভাগ্যে আমাদের সাহিত্যের পাঠও যথোচিত আনন্দের ছিল না। ওর মধ্যেও ছিল একটা বড় রকম বোঝার ভার। সাহিত্য বলতে অবশ্য বোঝাত ইংরেজি সাহিত্য। সংস্কৃত কাব্য যা দু’-একখানা পড়ানো হত তা সাহিত্য হিসাবে নয়, কী হিসাবে বলা কঠিন। কাব্যকে তার কবিত্ব থেকে বিমুক্ত করে তার anatomy-র উদঘাটন ছিল সংস্কৃত অধ্যাপকের কাজ। এবং সে anatomy-র বেশির ভাগ osteology, অস্থিবিদ্যা। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের ঐশ্বর্যও আমাদের কেবল আকর্ষণ করেনি, তার মধ্যে একটা স্পর্ধা যেন আমাদের আঘাত করত। পাঠ্য নির্বাচনে বড় ছোট লেখকের ভেদ ছিল না। ইংল্যান্ডে কিঞ্চিৎ সুনাম থাকলেই তিনি ছিলেন আমাদের পক্ষে যথেষ্ট শ্রেষ্ঠ লেখক, যদিও সম্ভব ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের বাইরে তার লেখা ইউরোপে আর কেউ পড়েনি। ব্রিটিশ শাসন যেমন নির্বিবাদে মানার জিনিস, ব্রিটিশ কবি ও লেখকের শ্রেষ্ঠত্বও ছিল তেমনি নির্বিচারে স্বীকারের বস্তু। এবং এ শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের বুঝিয়ে দিতে অধ্যাপকদের ক্রটি ছিল না, অবশ্য ইংরেজ সমালোচকের বই থেকে টুকে এনে। আমাদের সময় English Men of Letter, পর্যায়ের অনেক বই অবশ্য পাঠ্য ছিল। তাতে আমরা দেখতুম যে ইংরেজ লেখক মাত্রই অতি শ্রেষ্ঠ লেখক। যে কবি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা যায় না। তিনিও নাকি failure of a great poet। নিজের বোধ ও রুচি দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যের ভালমন্দ বিচার অধ্যাপকেরা কখনও করতেন না। সেটা হত খৃষ্টতা। ইংরেজি সাহিত্য আমাদের কাছে অনেকটা ছিল কার্জনি আমলের ব্রিটিশ ঔদ্ধত্যের একটা দিক।

কলেজের শিক্ষার এই inferiority complex আমাদের চিন্তাকে কবেছিল ভীরু ও পঙ্গু, রসবোধকে করেছিল অস্বাভাবিক ও অনুদার। মনের এই দুরবস্থা থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ে। তার কাব্যে আমরা সেই রাস পেলাম মন যাকে গ্রহণ করল। দ্বিধাহীন আনন্দে। তার নাম আমাদের অধ্যাপকদের কেউ কখনও উচ্চারণ করেননি, কিন্তু আমরা মনে জানলুম যেসব সাহিত্যের তাঁরা ‘নোট’ লেখান এ সাহিত্য তার থেকে খাটো নয়। এবং এ সাহিত্য যে লেখা হচ্ছে আমাদেরই মুখের ভাষায়, আর যিনি লিখেছেন

তাকে আমরা আমাদের মধ্যেই মাঝে মাঝে পাই–এ হয়েছিল আমাদের মনের বিশল্যকরণী। রবীন্দ্রনাথের কাব্যই যে প্রথম-যৌবনে যথার্থ সাহিত্যিক রসে আমাদের মনকে সরস করছিল। কেবল তা নয়, তার সাহিত্যই আমাদের মনের দীনতা ঘুচিয়ে ইংরেজি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের দিকে আমাদের মনকে অনুকুল করেছিল। তার সাহিত্যের আলোচনায় আমাদের মনে হয়েছিল যে আমরা নিজের মনে সাহিত্য-বিচারের একটি কষ্টিপাথর পেয়েছি যা ইংরেজি পুথি থেকে ধার-করা নয়, যাতে সোনাকে সোনা এবং পিতলকে পিতল বলেই চেনা যায়।

আমাদের কলেজে পড়ার সময়েই ‘প্রাচীন সাহিত্যের প্রবন্ধগুলি প্রায় লেখা হয়। আমাদের সাহিত্যিক রুচি ও অনুভূতির গড়নে সেগুলি ছিল অমূল্য। তাতেই আমরা উপলব্ধি করেছিলাম যে কালিদাসের কাব্য মল্লিনাথের টীকা নয়, বাল্মীকির রামায়ণ-ধর্মসংহিতা থেকে ভিন্ন।

আমাদের কলেজের শিক্ষার পাথরের চাপ রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যই বিদীর্ণ করেছিল –

‘ওরে চারিদিকে মোর ।

এ কী কারাগার ঘোর,

ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর।

ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখী,

এসেছে রবির কর।’

আষাঢ় ১৩৪৮

Category: প্রবন্ধাবলী